কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলন

মানস প্রতিম দাস

ষাটের দশকে কলকাতা ছিল এক অগ্নিগর্ভ শহর। মিছিল, জমায়েত, স্ট্রাইক, বন্‌ধ, সঙ্ঘর্ষ— এসব যেন কলকাতার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। প্রতিবাদে প্রতিরোধে সামিল হচ্ছিলেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্যসঙ্কট অসন্তোষে ভরিয়ে তুলেছিল সধারণ নাগরিকের মন। অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষের অনাচার গড়ে তুলছিল বিরাট ক্ষোভ। এরই ফলশ্রুতিতে নানারকম আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল গোটা শহর জুড়ে। এর পাশাপাশি ছিল বৈদেশিক ঘটনার প্রভাব যা ছাত্র সমাজ থেকে বুদ্ধিজীবী, সবাইকে এনে জড়ো করেছিল প্রতিবাদের মঞ্চে। এর মধ্যে প্রধান অবশ্যই ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যাদের মধ্যে বামপন্থী দলগুলো ছিল অন্যতম, এই অশান্ত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে তৎপর ছিল। প্রতিবাদের স্বাধীন কর্মসূচী হিসেবে শুরু হওয়া বহু ঘটনাই পরে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছিল। এই সব দল নিজেদের শাখা সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে তাকে রাজনৈতিক চেহারা দিয়েছিল। আন্দোলন-সংগ্রামের কিছু উদাহরণ সে সময়ের পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

১৯৬১-র শেষদিকে হিন্দুস্থান মোটর্স কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলন শুরু হয়।। সে বছরের ডিসেম্বর নাগাদ এই আন্দোলন পঞ্চাশ দিন অতিক্রম করে যায়। শ্রমিকদের সমর্থনে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গোটা শহর জুড়ে মিটিং, মিছিলের আয়োজন করে। চলে অর্থ সংগ্রহ অভিযান। দিনটা ছিল পাঁচ-ই ডিসেম্বর। ঐ একই দিনে নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত এবং তাঁর সহ অভিনেতারা শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে পথ নাটকের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন জানান।[১] শ্রমিকদের সমর্থনে শিল্পী মহলের এই উদ্যোগ তৎকালীন কলকাতায় বিরল ছিল না। ষাটের দশকের এই সময়টা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে খাদ্য আন্দোলনের জন্য। দেশের চরম খাদ্যসঙ্কটের প্রভাব পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গেও। রাজ্য জুড়ে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, তার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল

কলকাতা। ১৯৬২ থেকে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে খাদ্যশস্যের দামও বাড়তে শুরু করে। সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, নেমে আসেন রাস্তায়। বহুক্ষেত্রেই খাদ্যশস্যের গোডাউন খুলে নিম্নমূল্যে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় মালিককে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অসহায় সরকার, এই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণেও ব্যর্থ হয়েছিল। খাদ্য আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে ১৯৬৬ সালে। এই বছরে বহু জায়গায় বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশি নির্যাতন চলে। মার্চ মাসে কলকাতা শহরের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা শহরের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠি লেখেন। ঐ মাসেই শহরের চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলাকুশলীদের উদ্যোগে এক অর্থ সংগ্রহ অভিযান হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত বিক্ষোভকারীদের পরিবারকে সাহায্য করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এই অভিযান অবশেষে এক বিরাট মিছিলের আকার নিয়েছিল যাতে সমবেত হয়েছিলেন প্রায় দু'লক্ষ মানুষ। এরা জমায়েত হন ময়দানে।[২]

এদিকে ভিয়েতনামে মার্কিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তখন সরব কলকাতা। গোটা ষাটের দশক জুড়ে এই প্রতিবাদের পালা চলে। ভিয়েতনামে প্রথমে আগ্রাসনকারী ছিল ফরাসীরা, তারপরে আসে মার্কিনিরা। আগ্রাসনের চিত্র বদল হলেও কলকাতায় প্রতিবাদের চিত্র বদল হয়নি এতটুকু।[৩] ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামকে ঘিরে প্রতিবাদের স্রোতে বিপুলভাবে সামিল হন বুদ্ধিজীবীরা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনের পুরোভাগে নিজেদের সংগ্রামী চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৬৫-র জুলাই মাসে ছাত্রছাত্রী এবং বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে পালিত হয় 'ভিয়েতনাম সপ্তাহ'। স্ট্রাইক এবং বিক্ষোভে ভরে ওঠে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর এবং শহরের রাজপথ। এখানেই শেষ নয়, ১৯৭৫-এ সায়গণের পতন তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষের পাশে।[৪]

এভাবেই উত্তাল ছিল গোটা কলকাতা, ষাটের দশকে। এই প্রেক্ষাপটেই শহরে তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ। তখন অবশ্য 'তথ্যপ্রযুক্তি' শব্দটা পরিচিত ছিল না, পরিচিত ছিল 'অটোমেশন'। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে এই অটোমেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। যে কাজ মানুষ করত, সে কাজের দায়িত্ব নিল কম্পিউটার। একটি কম্পিউটার একসঙ্গে অনেক লোকের কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে। ফলে, কম্পিউটারের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল মানুষ। চাকরিজীবীর জন্য বিপদ ডেকে এনেছিল কম্পিউটার। কলকাতায় এ বিপদের সূচনা হয়েছিল পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে। ১৯৬৪ সাল নাগাদ ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া)

লিমিটেডের কলকাতা অফিস থেকে অ্যাকাউন্টস-এর কাজ স্থানান্তরিত হয় ঐ কোম্পানির বম্বে অফিসে। সেখানে তখন কাজ শুরু করে দিয়েছে কম্পিউটার। স্পষ্টতই, কোম্পানির পরিচালকরা চেয়েছিলেন বম্বে অফিসের কম্পিউটারের সাহায্যে কাজের কেন্দ্রীকরণ করতে। এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন। ১৯৬৫ সালে গঠিত হয় এক যুগ্ম কমিটি। এতে বাইশটি শিল্প ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছিল। এই কমিটির উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিল পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখা।[৫] তবে বড় বিপদ অপেক্ষা করে ছিল পেট্রোলিয়াম কর্মীদের জন্য বছরের শেষ নাগাদ।

১৯৬৬-র অক্টোবরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া)-র কলকাতা অফিসে। পূজোর ছুটিতে বম্বে থেকে একদল অফিসার এসে কলকাতা অফিস থেকে অ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত যাবতীয় ফাইল নিয়ে চলে গেলেন। তখন অফিসে ছুটি, পুরো কাজটাই হল গোপনে। ছুটির পর কাজে যোগ দিতে এসে অফিসের কর্মীরা আবিষ্কার করলেন, তাদের জন্য কোন কাজ আর রাখেনি কোম্পানির পরিচালকরা। ফাইলের সঙ্গে টেবিল-চেয়ারও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অসহায়, ক্ষুব্ধ কর্মীরা অফিসের শূন্য ঘরে ধর্না শুরু করলেন। তারিখটা ছিল ২৪শে অক্টোবর।[৬] একদিন, দু'দিন নয় এই ধর্না চলেছিল সাতশো উনষত্তর দিন ধরে। কোনও ফল অবশ্য ফলেনি। ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে কোম্পানি ছাঁটাই করল ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের কলকাতা অফিসের অষ্টাশি জন কর্মীকে। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রাম এই ছাঁটাই নিয়ে সংসদে সরব হয়েছিলেন। সংসদের সাতাশি জন সদস্যও কর্মীদের পুর্নবহাল দাবি করে। দেশ ও বিদেশের প্রায় আড়াইশো ট্রেড ইউনিয়ন সহানুভূতি জানায় কর্মীদের। এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা অবশ্য কোম্পানিকে টলাতে পারে নি।[৭]

এর পরের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অধ্যায় জানতে নজর দিতে হবে বীমা শিল্পের দিকে। ১৯৬৩-র ডিসেম্বরে যখন নাগপুরে অল ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সম্মেলন চলছিল, তখন মাদ্রাজের 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রের একটি কাটিং সম্মেলনে পাঠানো হয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কাটিং-এ ছিল একটি ছোট্ট সংবাদ—ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের পরিচালকমণ্ডলী নিগমের কাঠামোগত সংস্কারের কথা ভাবছেন। এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে কিছু

ডিভিশনাল অফিস ও ব্রাঞ্চ অফিস তুলে দেওয়া। অ্যাসোসিয়েশন খোঁজ করে জানতে পারল যে পরিচালকমণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে করণিকদের কাজে অটোমেশন আনার কথা চিন্তা করছেন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বহু কর্মী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বেন এবং কাজের কেন্দ্রীকরণ করে বেশ কিছু অফিস তুলে দেওয়া হবে। নাগপুরের সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশন দাবি তুলল যে পরিচালকমণ্ডলী এ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য তাদের জানাত।

পরিচালক মণ্ডলী কোন উত্তর না দেওয়ায় কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ বাড়ল। পরে জানা গেল, নিগমের কিছু অফিসার ১৯৬৩ সালে আমেরিকার বড় বড় কোম্পানি ঘুরে কম্পিউটারের কাজের ধরন জেনে এসেছেন। দেশে ফিরে তারা নিগমকে মার্কিনি ছাঁচে কম্পিউটার ব্যবহারের পরামর্শ দেন। নিগম সে পরামর্শ গ্রহণ করে। সরকারও সবুজ সঙ্কেত দেয়।[৮]

অ্যাসোসিয়েশন এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় পরিচালকমণ্ডলী ও সরকার তাদের এই বলে শান্ত করার চেষ্টা করে যে নিগমে কম্পিউটার বসার ফলে কোন কর্মী ছাঁটাই হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন চুক্তিতে যেতে রাজি হয়নি সরকার বা পরিচালকমণ্ডলী। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের পর পর দেশব্যাপী অবসাদের সুযোগ ও অ্যাসোসিয়েশনের অসতর্কতার সুবিধে নিয়ে পরিচালকমণ্ডলী নিগমের বম্বে অফিসে একটি আই.বি.এম. কোম্পানির কম্পিউটার বসান। এর প্রতিবাদে ডিসেম্বরে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লীতে। প্রায় আটত্রিশটি জাতীয় কর্মী ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন এতে সামিল হয়। এর পরবর্তীকালে দেশজুড়ে শত শত কনভেনশন, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় অটোমেশনের বিরুদ্ধে। কলকাতায় এই আন্দোলনের ধারা ছিল তীব্র। ১৯৬৬-এর পঁচিশ থেকে উনত্রিশে ডিসেম্বর যে জেনারেল কাউন্সিল মিটিং হয় তাতে অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা লাগাতার স্ট্রাইক এবং সরকার ও পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।[৯]

বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের পরিচালকমণ্ডলী ততদিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে কলকাতার ইলাকো হাউসের অফিসে বসানো হবে নিগমের দ্বিতীয় কম্পিউটারটি। কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই কম্পিউটারের অনুপ্রবেশ যে কোনও উপায়ে ঠেকাতে নির্দেশ দিলেন কলকাতার বীমা কর্মচারীদের। শুরু হল ইলাকো হাউস অবরোধ আন্দোলন। তারিখটা ছিল ১৯৬৭ সালের তেসরা মার্চ। পাশাপাশি দেশজুড়ে স্ট্রাইক ইত্যাদি চলছিল। পরিচালকমণ্ডলী এর বিরুদ্ধে

কড়া ব্যবস্থা নিতে শুরু করলেন। কোন ক্ষেত্রে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট অর্থাৎ মাইনে বৃদ্ধির দিন পিছিয়ে দেওয়া, কোনও ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের শাস্তি দেওয়া এসব চলতেই লাগল।[১০] এদিকে সারা দেশে অটোমেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুলাই স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির বিশেষ মিটিং আহ্বান করে। সাধারণভাবে যাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই এই কমিটিতে তাদেরও আহ্বান করা হয় এই মিটিংয়ে। ভারতীয় জীবন বীমা নিগম, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রেল এবং পেট্রোলিয়াম কোম্পানির কর্মী ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এই মিটিংয়ে অংশ নেয়। অবশ্য কোন সমাধান বের হয়ে আসেনি এই মিটিং থেকে।[১১]

কলকাতায় ইলাকো হাউসের অবরোধ ততদিনে আরও সঙ্ঘবদ্ধ আকার নিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে ওই সময়টাতে কোন নির্বাচিত সরকার ছিল না। সংবিধানের তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা প্রয়োগ করে ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল বরখাস্ত করেন নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে। ফলে ইলাকো হাউসের 'অবরোধের সময় রাজ্যপালই ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা।[১২] তিনি ইলাকো হাউসে কম্পিউটার বসানোর ব্যাপারে নিগম কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। বড় রকম বিপদের আঁচ পেয়ে ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন অবরোধে সামিল হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দল তথা সর্বস্তরের মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানায়।[১৩]

আহ্বানে সাড়া দেন রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। অবরোধ জোরদার হয়। ঐ বছর পুজোর কিছু আগে অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পায় যে পুজোর ছুটির সুযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ ইলাকো হাউসে কম্পিউটার বসাবে। এই খবর পেয়ে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের কর্মচারীরা পুজোর সময়ও সারারাতব্যাপী অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৪] এই অবরোধে বীমা কর্মচারীদের পাশে ছিল রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি, বারোই জুলাই কমিটি এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো। ২৮শে সেপ্টেম্বর, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে আন্দোলনকারীরা। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জ্যোতিবাবু বলেন যে যুক্তফ্রন্ট অটোমেশনের বিরোধী। অন্যদিকে, কেন্দ্রের কংগ্রেস চালিত সরকার নিজেদের ঘোষিত নীতির বিরোধিতা করে এই অটোমেশনকে সাহায্য করছে।[১৫]

কর্মচারীদের সতর্কতায় ইলাকো হাউসে কোন কম্পিউটার বসানো গেল না পুজোর সময়। এদিকে, পরিচালকমণ্ডলী খবরের কাগজে একের পর এক বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে কম্পিউটার কারও চাকরি কেড়ে নেয় না। কর্মচারীরা এই প্রচারে কান দিলেন না। পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে কম্পিউটারের কারণে কর্মী

ছাঁটাইয়ের ঘটনা তাঁরা আগেই দেখেছিলেন। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে বার্মা শেল কোম্পানিতে তিনশো চল্লিশ জন কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণও যে অটোমেশন, সে ব্যাপারেও তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন।[১৬] এদিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটল পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করল যুক্তফ্রন্ট। নবনির্বাচিত সরকারের কাছে ভারতীয় জীবনবীমা নিগম কর্তৃপক্ষ ইলাকো হাউসে কম্পিউটার বসানোর অনুমতি চাইলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এইভাবে কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে ইলাকো হাউস পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৭]

কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনের আর এক বড় শরিক ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। অবশ্য তাঁরা যে তথ্যপ্রযুক্তির মূল যন্ত্র কম্পিউটারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে একজোট ছিলেন, তা নয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বৃহত্তম অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ভারতের মত বিকাশশীল অর্থনীতিতে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তবে এর ফলে যেন কারও চাকরি না যায় সে ব্যাপারেও তাঁরা নিজেদের দাবি তুলে ধরেছিলেন। তবে অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশন এই ব্যাপারে পুরোপুরি সহমত ছিল না।[১৮]

১৯৬৬ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালক মণ্ডলীর মহাসংগঠন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন এবং বিভিন্ন কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে অটোমেশন বা কম্পিউটার বসানো নিয়ে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে অটোমেশনের প্রকৃতি আলোচিত হয়। অটোমেশনের ফলে কোনও চাকরি না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এই চুক্তিতে।[১৯] এই ধরনের জাতীয় চুক্তির বাইরেও বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্ক নিজেদের কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে কম্পিউটার বসানো নিয়ে চুক্তি করে। এই ক্ষেত্রে বিফল হয় গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক। অল ইন্ডিয়া গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। তিন মাসেরও বেশি এই আন্দোলন চলে। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখায় এই আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিল। অবশেষে, নতুন দিল্লীতে এক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের অবসান হয়।[২০] ঐ একই বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বম্বে শাখায় কম্পিউটার বসানো নিয়ে সারা দেশে আন্দোলন শুরু করেন এই ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। আন্দোলন সত্ত্বেও পুলিশি সাহায্য নিয়ে তেসরা মে বম্বে শাখায় কম্পিউটার বসানো হয়। এই আন্দোলনের বেশ কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় যার মধ্যে কলকাতারও কিছু নেতা ছিলেন।[২১]

বিভিন্ন কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লাভজনক চুক্তিতে আসা। ১৯৮৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এরকম এক চুক্তি

স্বাক্ষরিত হল আটান্নটি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনগুলির মধ্যে। ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন বা আই.বি.এ. এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। আবার তথ্যপ্রযুক্তি তথা অটোমেশন সম্পর্কিত কিছু বিধি প্রণয়ন হল, অটোমেশনের ফলে চাকরি না যাওয়া প্রতিশ্রুত হল এবং কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এমন কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ভাতা ঘোষিত হল।[২২] এদিকে, ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন নামে একটি নতুন সংগঠন, যা অটোমেশন প্রসঙ্গে এ.আই.বি.ই.এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করছিল। পরবর্তী বছরে এই সংগঠনটি জাতীয় স্তরে একটি সংগঠন হিসেবে নিজেদের ছড়িয়ে দেয়। এই ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া বা সংক্ষেপে বি.ই.এফ.আই. কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে এক বড় ভূমিকা নেয়। মূলতঃ এ.আই.বি.ই.এ. থেকে বেরিয়ে আসা এই সংগঠনের সদস্য তথা নেতাদের বক্তব্য ছিল চূড়ান্তভাবে অটোমেশন বিরোধী। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নরেশ পাল মনে করতেন, এ.আই.বি.ই.এ. অটোমেশন প্রসঙ্গে সমঝোতার পথ নিয়েছে। ওই সংগঠন আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়েছে বলে তিনি মত দেন।[২৩]

১৯৮৫ সালে বি.ই.এফ.আই. কলকাতার হংকং ব্যাঙ্কে অটোমেশনের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ অবরোধের পথ নেয়। মে থেকে অক্টোবর, মোট একশো চল্লিশ দিন ধরে চলে এই আন্দোলন।[২৪] তবে এই আন্দোলন যে খুব সংগঠিত ও সফল হয়ে উঠতে পেরেছিল, এমন নয়। সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের উপযুক্ত সমর্থন না পেয়ে এই আন্দোলন দাড়িয়ে ছিল সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন বা সি.আই.টি.ইউ-র সমর্থনের উপর। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এই সি.আই.টি.ইউ. ছিল পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসক জোট বামফ্রন্টের মুখ্য শরিক কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিষ্ট)-এর ট্রেড ইউনিয়ন শাখা। এই পার্টিরই নেতা তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অবশ্য এই আন্দোলনকে সুনজরে দেখেননি। বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী তার ক্ষোভ জানিয়ে পার্টি পলিটব্যুরোকে চিঠি লেখেন এবং এ ধরনের আন্দোলন মোকাবিলার নির্দেশিকা চান। পরবর্তীকালে অবশ্য বি.ই.এফ.আই. কে অগ্রাহ্য করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আদালতের আদেশবলে ব্যাঙ্কে কম্পিউটার বসাতে সমর্থ হন। আন্দোলনও প্রত্যাহৃত হয় অক্টোবরে।[২৫]

এ ধরনের আরও কিছু আন্দোলন বি.ই.এফ.আই-এর নেতৃত্বে আশির দশকের শেষ দিকে কলকাতায় সংগঠিত হলেও তার জোর উল্লেখযোগ্য ছিল না। ততদিনে অটোমেশনের ফলে চাকরি না যাওয়ার ব্যাপারটি প্রতিশ্রুত হওয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টি

অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিষ্ট) বা সি.পি.আই (এম) চালিত সরকার এ ধরনের আন্দোলনকে সাহায্য করতে নারাজ ছিল। রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতিকে চাঙ্গা করতে কলকাতায় আন্দোলনমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই সম্ভবতঃ সরকারের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য সবক্ষেত্রে পার্টি ও সরকারের মধ্যে যে এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য ছিল এমন নয়।[২৬] আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভাজন ছিল পার্টির মধ্যেও যা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে বাইরে প্রকাশিত হত। যাই হোক, বি.ই.এফ.আই. আন্দোলনের পথ থেকে সরে এসে চুক্তির পথে প্রবেশ করে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। ফলে, সারা দেশসহ কলকাতাতে কম্পিউটারের প্রবেশ ঘটতে থাকে সমঝোতার মাধ্যমে।[২৭]

ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্মচারীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের পাশে কলকাতায় যে আর কোনও রকম তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলন ঘটেনি, এমন বলাটা ঠিক হবে না। বস্তুতঃ এক সময় কলকাতায় কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতি থেকে শুরু করে রেলের কর্মচারী সমিতি— সবার কাছেই অবশ্য করণীয় কাজ হয়ে উঠেছিল। সত্তরের দশকের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে আমদানি করা কম্পিউটার স্থাপন করার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের আন্দোলনকে প্রশমিত করতে রাজ্য পালের কঠোর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।[২৮] অন্যদিকে, পূর্ব রেল যখন পরিষেবায় কম্পিউটার আনতে উদ্যত তখন তাদের কর্মচারীদের জোরদার আন্দোলন এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিল।[২৯]

বলা বাহুল্য, এ সব আন্দোলন কেউ শখ করে শুরু করেনি। তথ্যপ্রযুক্তির ধাক্কায় নিজেদের চাকরি খুইয়ে বা চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কা থেকেই এ ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত। তবে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সময়কার লুডাইটদের মত কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধীরা মেশিন ভাঙেননি। তারা স্বীকৃত পথেই আন্দোলন করেছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের পটভূমিকায় এ আন্দোলন স্বাভাবিক। কারণ খুব সামান্য সময়ের পরিসরে আধুনিকীকরণের নামে এখানে জোর করে প্রযুক্তি ঢোকানো হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। এহেন মত পোষণ করেছেন সমাজ বিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন। তাঁর মতে পাশ্চাত্যে যা দুশো বছর ধরে ঘটেছে সেই আধুনিক প্রযুক্তিকে এবং শিল্পায়নকে যদি পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মূলতঃ কৃষিভিত্তিক সভ্যতার মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয় তবে বিশৃঙ্খলা এবং আন্দোলন হবে স্বাভাবিক পরিণতি।[৩০]

সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) অরূপ কুমার দাস (সম্পাদিত); গণযুগের দিনপঞ্জী (১৯৬০-১৯৭৯) প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০০২, পৃ. ৫-৬।
২) ঐ, পৃ. ৭-১৭।
৩) অঞ্জন বেরা, "ভিয়েতনাম দিবস ১৯৪৭", প্রকাশিত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সঙ্কলিত), "ভিয়েতনাম ও কলকাতা", পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, মে ২০০০, পৃ. ৭-১৭।
৪) "ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামে ষাট-সত্তর দশকের কলকাতা" (দিনপঞ্জী), ঐ, পৃ. ২৬-৩২।
৫) শান্তি শেখর বসু, "মডার্নাইজেশন ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইন্ডিয়ান সিচুয়েশন", কর্মচারী সমিতির স্যুভেনির, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এজরা স্ট্রীট শাখা, ১৯৯৯।
৬) চন্দ্র শেখর বসু, "এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন", অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত, জানুয়ারী ১৯৭৮, পৃ. ১০৫।
৭) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, ডিসেম্বর ১, ১৯৬৮।
৮) চন্দ্র শেখর বসু, আগে উল্লিখিত, পৃ. ৯৭-৯৯।
৯) ঐ, পৃ. ১০০-১০৪।
১০) ঐ, পৃ. ১০৫-১০৭।
১১) রিপোর্ট অফ দ্য কমিটি অন অটোমেশন, ১৯৭২, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন, পৃ. ৫-৬।
১২) অরূপ কুমার দাস, আগে উল্লিখিত, পৃ. ১৭ এবং ২০।
১৩) চন্দ্র শেখর বসু, আগে উল্লিখিত, পৃ. ১০৯।
১৪) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৬৮।
১৫) দৈনিক বসুমতী. কলকাতা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৬৮।
১৬) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৬৮।
১৭) চন্দ্র শেখর বসু, আগে উল্লিখিত।
১৮) পি.এস. সুন্দরেশন, "এ ট্রেড ইউনিয়ন ওডিসি! দ্য হিস্ট্রি অফ অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন", কর্ণাটক প্রদেশ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ব্যাঙ্গালোর, ১৯৯৬, পৃ. ২৪২-২৪৯।
১৯) সেট্‌লমেন্ট অন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট্‌স বিট্যুইন সার্টেইন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার্কমেন, ১৯ অক্টোবর, ১৯৬৬, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন।
২০) সুবিনয় রায়, "স্মৃতির ঝলকে কিছু কথা", প্রকাশিত পিনাকপাণি দত্ত (সম্পাদিত), "অবিসংবাদী নরেশ পাল", সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ ইউনিয়ন, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২, পৃ. ৯৭-৯৯।
২১) অরূপ কুমার দাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২২।
২২) মেমোরান্ডাম অফ সেট্‌লমেন্ট, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, বিট্যুইন দ্য ম্যানেজমেন্টস অফ

ফিফটি এইট ব্যাঙ্কস অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার্কমেন অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ।

২৩) পিনাকপাণি দত্ত, আগে উল্লিখিত, পৃ. ৬৮-৬৯।

২৪) ঐ, পৃ. ২৩৯।

২৫) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২১ নভেম্বর, ১৯৮৫।

২৬) পিনাকপানি দত্ত, আগে উল্লিখিত, পৃ. ৬৮-৬৯।

২৭) ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রদীপ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ১৯, ২০০১।

২৮) শুভাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ, সাক্ষাৎকার।

২৯) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

৩০) স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন, "দ্য ক্ল্যাস অফ সিভিলাইজেশন্‌স অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অফ ওয়ার্ল্ড অর্ডার", পেঙ্গুইন বুক্‌স, ইন্ডিয়া, ১৯৯৭, পৃ. ৯৭।